মতিয়ার বাম্পার আওয়ামী লীগের একমাত্র ভরসা

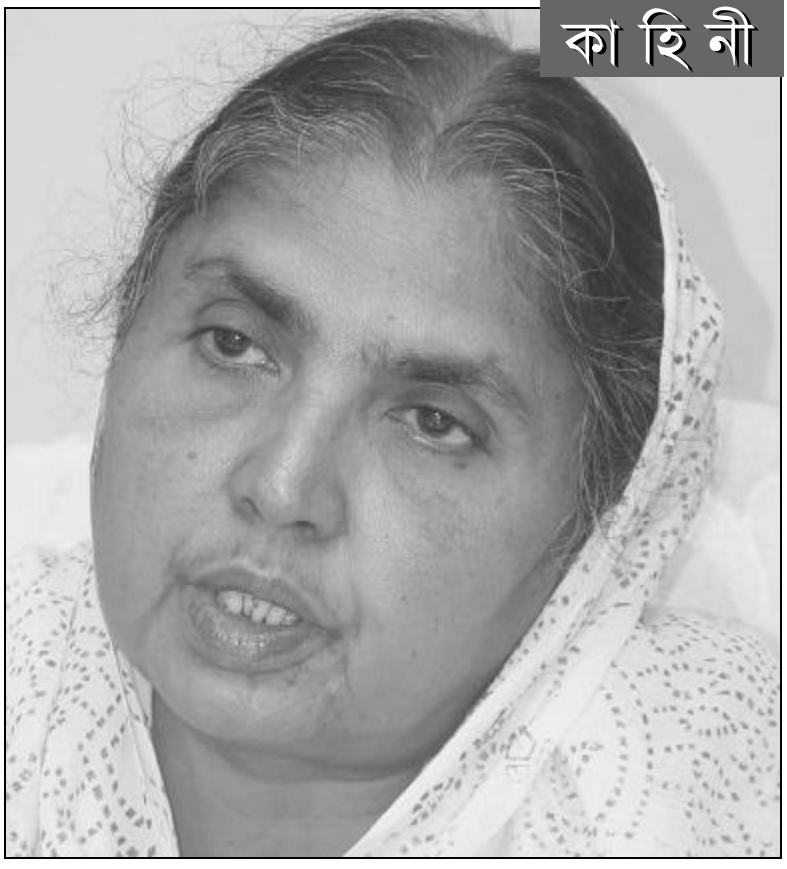

ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনে বিএনপি'র মন্ত্রীরা পরাজিত না হলে আওয়ামী লীগের পক্ষে সরকার গঠন সম্ভব হত না। ১৯জন মন্ত্রী ২০টি আসনে পরাজিত হয়েছিলেন। সালাম তালুকদার হেরেছিলেন ২টি আসনেই। পরাজিত হয়েছিলেন অনেক রথী মহারথী। সালাম তালুকদার ছাড়াও হেরেছিলেন কৃষিমন্ত্রী মজিদ উল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতিন চৌধুরী, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, পরিবেশ মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান এবং আরো অনেক মন্ত্রী। বিএনপি'র এই 'নক্ষত্র'দের পতনের কারণ ছিল সরকারের কার্যক্রম পরিচালনায় চরমভাবে ব্যর্থতা। তাদের ২০টি আসনের মধ্যে উনিশটি চলে যায় আওয়ামী লীগের দখলে, একটি পায় জাপা। এবারের নির্বাচনেও মন্ত্রীদের জয়-পরাজয়ের ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। আওয়ামী লীগের কয়েক ডজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রীর অবশ্য কীর্তির চেয়ে কুকীর্তি বেশি। কিন্তু একজনের সফলতাই আওয়ামী লীগের শেষ ভরসা ... লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসবে এই আশা তারা খুব জোরালোভাবেই করে। তাদের এই আশার পেছনে জোরালো যুক্তি খুঁজে পাওয়া না গেলেও, তারা আশাবাদী, বলা যায় প্রবলভাবে আশাবাদী। অথচ যে জনগণ ভোট দেবে সেই জনগণের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি আওয়ামী লীগ। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির হয়েছে চরম অবনতি। বিদ্যুৎ সংকটে ঢাকা শহরের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। সারা দেশের মানুষ তো হিসেবের মধ্যেই নেই। প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ নির্দেশের পরও সংকট কমেনি। টেলিযোগাযোগখাতে উন্নতি হয়েছে। তবে এখানে সরকারের কৃতিত্ব খুব কম। মোবাইল কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দিয়েছে। পাশাপাশি সরকারি টেলিফোনের জটিলতা আরো বেড়েছে, কমেনি। বাংলাদেশে একটি ফোনের জন্য ১৮ হাজার টাকা জমা দিয়ে তদবির না করলে ১৮ বছরেও সংযোগ্য পাওয়া যায় না। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী কলকাতায় মাত্র ৫ হাজার টাকা জমা দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে টেলিফোন পাওয়া যায়। এই অর্থও আবার কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়। আমাদের বর্তমান টিএন্ডটি মন্ত্রণালয়ের কৃতিত্ব একটি জায়গাতেই, সেটা হলো– বিএনপি সরকার শুধু তাদের নেতা মোরশেদ খানকে মোবাইল ব্যবসা করার সুযোগ দিয়েছিল, আর বর্তমান সরকার তিনটি কোম্পানিকে সেই সুযোগ দিয়েছে। টিএন্ডটি মন্ত্রী মাঝে মাঝে হুমকি দেন, টিএন্ডটি মোবাইল টেলিফোন ছাড়বে। যার কোনো লক্ষণ এখনো পর্যন্ত বাস্তবে দেখা যায়নি।

প্রতিদিন দেশে খুন হচ্ছে ১১ জন মানব সন্তান। খুনিদের প্রায় সবাই সমাজের পরিচিত। চিহ্নিত। অনেকের গায়েই রয়েছে আওয়ামী লীগ বা যুবলীগের লেবেল। পুলিশ তাদের ধরছে না

ভারতের সঙ্গে পানি বন্টন চুক্তির জন্যে কৃতিত্ব পাওয়ার কথা পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাকের। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী ভারত পানি দিয়েছে কী দেয়নি সেটা ভিন্ন বিতর্ক। বাস্তবে যেটা ঘটেছে তা হলো, বাংলাদেশের নদীতে শুষ্ক মৌসুমে পানি দেখা যায়নি। তাই রাজ্জাকের কৃতিত্বও প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি করে শান্তি ফিরিয়ে আনা এই সরকারের বিশাল বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছিল প্রথমদিকে। কিন্তু এই চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার পেলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসেনি। এটাই বাস্তবতা। শান্তি ফিরে না আসার জন্য সরকারই যে অনেকখানি দায়ী সেটাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

এতটা প্রকাশ্যে, এতটা নির্লজ্জভাবে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা দেশে আর কখনো ঘটেনি। বিএনপি সরকার প্রেসক্লাবে ঢুকে সাংবাদিকদের পিটিয়েছে এ কথা সত্যি। কিন্তু পেটানোর পর সরকার নমনীয় হয়েছে, দুঃখ প্রকাশ করেছে। আর আওয়ামী সাংসদ জয়নাল হাজারী সাংবাদিক টিপুকে পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলার উদ্যোগ নিলেও প্রধানমন্ত্রী পক্ষ নিয়েছেন জয়নাল হাজারীর। টিপুর সাংবাদিক পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিকের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বিষয়ক বক্তৃতা করতে গিয়ে নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি মানুষকে আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

নিজের আত্মীয়-স্বজন, দলীয় সাংসদ, মন্ত্রীপুত্রদের সন্ত্রাস, দখল, হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি নীরব। এসব কারণে প্রধানমন্ত্রীর ইমেজ সারা দেশ জুড়েই কমেছে। জাতির জনকের দুই কন্যার জীবন রক্ষার নতুন আইন সত্যি সত্যি করা হলে প্রধানমন্ত্রীর ইমেজ ভয়াবহভাবে কমতে পারে। ডেকে নিয়ে আসতে পারে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপর্যয়।

বর্তমান আওয়ামী সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। প্রতিদিন দেশে খুন হচ্ছে ১১ জন মানব সন্তান। খুনিদের প্রায় সবাই সমাজের পরিচিত। চিহ্নিত। অনেকের গায়েই রয়েছে আওয়ামী লীগ বা যুবলীগের লেবেল। পুলিশ তাদের ধরছে না। সরকারও পুলিশকে ধরতে বাধ্য করছে না। উল্টো সরকার না ধরার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার সবই করছে।

ডলারের দাম বারবার কমানোয় পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ার অবস্থা। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নেমে গেছে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। শেয়ার বাজারের কেলেংকারি ও বিপর্যয়ের কোনো বিচার হয়নি। ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুংকার প্রথমদিকে থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ঝিমিয়ে পড়েছে। বরং খেলাপি ঋণের নিয়ম-কানুন শিথিল করা হয়েছে। রাজস্ব আদায়ে উচ্চাভিলাসী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হারে রাজস্ব বাড়েনি। সাফল্য আসেনি বেসরকারিকরণ কার্যক্রমে। ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বরাবরই সমালোচিত হয়েছে। দুই দফায় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় এক ডজনের বেশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুমতি দেয়া হয়েছে। দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

গত পাঁচ বছরে দেশে গড়ে ওঠেনি কোনো ভারী শিল্প। বিদেশী বিনিয়োগ নিয়ে যাদের আসার কথা ছিল, তারা আসেনি। যে বিদেশী কোম্পানিগুলো এসেছিল তাদেরও কেউ কেউ এক পর্যায়ে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেছে। আমদানি একতরফাভাবে বেড়েছেই, ভারতসহ সব দেশের সঙ্গে।

তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অবশ্য একটা গতিময়তা এসেছিল। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মুখপাত্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা সুসংহত করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ইউরোপের বাজারে পোশাক শিল্পের জিএসপি সংকট নিরসনে তৎকালীন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হিসেবে তিনি যে ভূমিকা নেন তার সুফল পেয়েছে দেশের গার্মেন্টস শিল্প। কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব স্থানান্তর করে আব্দুল জলিলকে দেয়ার পর এ মন্ত্রণালয় কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টিডিএ বিল অনুমোদন করে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে। পোশাক মালিকদের বারবার তাগাদা সত্ত্বেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কোনো তৎপরতা দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। বাণিজ্য সম্প্রসারণে সক্রিয় সহযোগিতামূলক কাজের চেয়ে বাগাড়ম্বরই বেশি হয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগ আনার কোনো তৎপরতাই দেখাতে পারেনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

আওয়ামী সরকারের কয়েক ডজন মন্ত্রীর মধ্যে বেশ কয়েকজন আলোচনায় এসেছেন তাদের কর্ম দিয়ে নয়, আলোচিত হয়েছেন অপকর্ম দিয়ে। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া তার মন্ত্রণালয়ের কাজের জন্য আলোচিত হননি। আলোচিত হয়েছেন তার পুত্র দিপু চৌধুরীর হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি আর দখলের কারণে। মেয়র হানিফ আলোচনায় আসেন নগরবাসীর চাহিদার সামান্য অংশও পূরণ করতে না পেরে। মানুষ হানিফকে স্মরণ করে মশার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, রাস্তার পাশে জমে থাকা ময়লার গন্ধে নাকে হাত দিয়ে। চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী আলোচনায় আসেন চিহ্নিত সন্ত্রাসী মামুনকে আশ্রয় দিয়ে। জিল্লুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী। উল্লেখ করা যায় এমন কোনো কাজ তিনি করেছেন বলে জানা যায় না। পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যা কিছু অর্জন তার প্রায় সবকিছুরই কৃতিত্বের দাবিদার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরীর। পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবীণ রাজনীতিবিদ পররাষ্ট্র বিষয়ক কিছু নয়, তিনি ব্যস্ত ছিলেন সিলেটের রাজনীতি এবং দলীয় কোন্দলে নেতৃত্ব দেয়া নিয়ে। আবার আওয়ামী লীগের মন্ত্রী না হয়েও

জিল্লুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী। উল্লেখ করা যায় এমন কোনো কাজ তিনি করেছেন বলে জানা যায় না

পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবীণ রাজনীতিবিদ পররাষ্ট্র বিষয়ক কিছু নয়, তিনি ব্যস্ত ছিলেন সিলেটের রাজনীতি এবং দলীয় কোন্দলে নেতৃত্ব দেয়া নিয়ে

মায়া তার মন্ত্রণালয়ের কাজের জন্য আলোচিত হননি। আলোচিত হয়েছেন তার পুত্র দিপু চৌধুরীর হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির জন্য

ডলারের দাম বারবার কমানোয় পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ার অবস্থা। শেয়ার বাজারের কেলেংকারি ও বিপর্যয়ের কোনো বিচার হয়নি

অনেক সাফল্যের নজির রেখে যাচ্ছেন যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। পূর্ত প্রতিমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন প্লট বরাদ্দে কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়ে আওয়ামী সরকারের ভাবমূর্তি অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের আরো বেশ কয়েকজন মন্ত্রী আছেন, মানুষ তাদের নামও ভালো করে জানে না।

তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অবশ্য একটা গতিময়তা এসেছিল। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মুখপাত্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা সুসংহত করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে

এতকিছুর পরও মূলত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে শহরাঞ্চলে আওয়ামী লীগের অবস্থা বেশ নাজুক। এই লেখায় যা আলোচনা করা হলো তা থেকে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে এমন আলামত পাওয়া যায় না।

তারপরও আওয়ামী লীগ কেন আশাবাদী? কেন আওয়ামী লীগকে দেশের মানুষ ভোট দেবে?

এই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধানে জানা যায়, একজন মাত্র মানুষ বাঁচিয়ে দিয়েছেন আওয়ামী সরকারকে। আবার ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে আশাবাদী করে তুলেছেন আওয়ামী নেতাদের। প্রায় সব নেতার ব্যর্থতাকে ম্লান করে দিয়েছেন তিনি তার সাফল্য দিয়ে। ক্ষমতায় আসার আগেও প্রতিটি আন্দোলনে তাকে দেখা যেত রাজপথে। পুলিশের প্রথম আঘাতটি পড়ত তার গায়েই। তার নাম মতিয়া চৌধুরী। তিনি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের কৃষিমন্ত্রী। কয়েক মাস আগ পর্যন্ত অবশ্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও তার হাতেই ছিল। মতিয়া চৌধুরীই সম্ভবত একমাত্র মন্ত্রী, যার সততা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কোনো প্রশ্ন নেই। বিরোধী দলে থাকার সময়ে তাকে বলা হত অগ্নিকন্যা। সেখানেও ছিলেন তিনি সফল। মন্ত্রী হিসেবেও দেখিয়েছেন পুরোপুরি দক্ষতা।

মানুষ হানিফকে স্মরণ করে মশার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, রাস্তার পাশে জমে থাকা ময়লার গন্ধে নাকে হাত দিয়ে

এই মতিয়া চৌধুরীর ওপর ভর করেই আবার ক্ষমতায় আসতে চাইছে আওয়ামী লীগ।

দেশে বাম্পার ফলন ফলিয়েছেন কৃষক। প্রকৃতি তাদের সহায়তা করেছে। আর কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী তাদের প্রতিটি উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন। বিএনপি সরকার যে জায়গাটিতে খুব বড়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। বিএনপি সরকার কৃষকের ঘরে সার পৌঁছাতে পারেনি। সার চাইতে এসেছিল কৃষক, আর বিএনপি সরকারের পুলিশ তাদের গুলি করে হত্যা করেছিল। সরকারি মূল্যের চেয়ে তখন কয়েকগুণ বেশি দামে সার কিনতে হয়েছিল কৃষককে। আর বর্তমান সরকারের সময়ে সরকারি মূল্যের চেয়েও কম দামে খোলা বাজারে বিক্রি হয়েছে সার। সার যদিও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে, তারপরও মতিয়া চৌধুরী সব সময় অসম্ভব সতর্ক থেকেছেন এ বিষয়ে। ফলে কৃষক সার পেয়েছে সব সময়। পাম্প চালানোর জন্য সংকট দেখা দেয়নি তেলের। ৭২ ঘণ্টা হরতালের মধ্যেও বিশেষ ব্যবস্থায় দেশজুড়ে তেল সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন মতিয়া চৌধুরী। শুধু সার বা তেল নয়, কৃষির প্রতিটি উপকরণ যথাসময়ে পৌঁছেছে কৃষকের হাতে। এর সঙ্গে অন্য মন্ত্রণালয়গুলো জড়িত। জড়িত আরো অনেক লোক। এ কথা মতিয়া চৌধুরী নিজেও মনে করেন। তবে সাফল্য এসেছে বলেই অন্যদের প্রসঙ্গ আসছে। ব্যর্থতা আসলে এককভাবে দায়িত্ব নিতে হতো মতিয়া চৌধুরীকেই।

লাগাতার হরতাল বা খুনের ঘটনা নিয়ে বাংলার কৃষক চিন্তিত নয়। এর জন্য তার কিছু যায়-আসে না। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত মধ্যবিত্ত। যারা বাস করে মূলত শহরে। এই মধ্যবিত্তের ভোট আওয়ামী লীগ পাবে কিনা সন্দেহ আছে। মধ্যবিত্তের ভোট যদি না পায় তাহলে শহরাঞ্চলে আসন কমবে আওয়ামী লীগের। কিন্তু আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা বাড়তে পারে গ্রামে। কারণ গ্রামের মানুষ খাদ্যের নিশ্চয়তা পেয়েছে। গ্রামের মানুষের চাহিদা সামান্য। তারা অত কিছু বোঝে না, পেটে খাবার থাকলেই সব ঠিক। ঘরে চাল আছে কিনা সেটাই তাদের মূল প্রশ্ন। কৃষকের কথা যারা ভাবে কৃষক তাকে প্রতিদানও দেয়।

বাম্পার ফলনের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব কৃষকের, মতিয়া চৌধুরীর নয়– এমন প্রশ্ন করতেই পারেন অনেকে। কৃষক পরিশ্রম করেছে, এ কথা কেউই অস্বীকার করে না। তাই বলে এই সাফল্যের অংশ থেকে মতিয়া চৌধুরীকে বাদও দেয়া যাবে না। কৃষক পরিশ্রম শুধু বর্তমানে নয়, অতীতেও করেছে। কিন্তু সে ফল পায়নি। কারণ কী? কারণ মতিয়া চৌধুরীর মতো কোনো নেতৃত্ব সেদিন কৃষকের পাশে ছিল না। একজন সৎ এবং যোগ্য নেতা সাধারণের মানুষের পাশে থাকলে তারা যে অনেক কিছু করতে পারে– সেটা মতিয়া চৌধুরী প্রমাণ করেছেন।

আওয়ামী রাজনীতিবিদদের মধ্যে মতিয়া চৌধুরীই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যিনি কৃষক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। মন্ত্রী হয়েও তার জীবনযাপনে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

২৭ মে সাক্ষাৎকারের জন্য ফোন করলে কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী পরের দিন ফোন করতে বললেন। পরের দিন ফোন করতেই বললেন, 'এখন সচিবালয়ে চলে আসেন।' লাঞ্চের পরে আসব কিনা জানতে চাইলে বললেন, 'আমি তো সকালে একবারে ভাত খেয়ে অফিসে আসি। এখনি চলে আসেন।'

কৃষকও সকালে ভাত খেয়েই মাঠে যায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে। যাদের জন্যে কাজ করেন একজন মতিয়া চৌধুরী। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করেন অনেকে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় প্রায় এসে গেছে। ক্ষমতায় থাকার এই পাঁচ বছর সময়কে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

মতিয়া চৌধুরী : একটি সদ্য স্বাধীন দেশকে গুছিয়ে ওঠার জন্যে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তার আগেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। তারপর একুশ বছর ছিল উল্টা পথে যাত্রা। '৯৬ সালে আমরা ক্ষমতায় এসেছি, তখন দুটি কাজ করতে হয়েছে। উল্টা পথ থেকে আমাদের 'ইউ' টার্ন নিতে হয়েছে। তারপর '৭৫-এ যে অবস্থানে ছিল সেখান থেকে সামনের দিকে এগুতে হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী একটি বাংলাদেশ আমরা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আমরা কিছুটা সফল হয়েছি এই কারণে যে, আমাদের ইনডিকেটর সব সময় সামনের দিকে।

২০০০ : আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে আপনারা কতটা আশাবাদী?

মতিয়া চৌধুরী : আমরা জনগণের জন্য কাজ করেছি। মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে আল্লাহর রহমতে সক্ষম হয়েছি। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ট্র্যাকে আনতে অনেকখানি সফল হয়েছি। কূটনীতিতে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য আছে। মোট কথা আমরা পেরেছি এমন কাজের সংখ্যাই বেশি। আর যেটা পারিনি, সেটা আগামীতে পারব এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে

সৃষ্টি হয়েছে। ইনশাল্লাহ আগামীতে আমরা জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হবো।

২০০০ : আপনার কৃষির ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু...

মতিয়া চৌধুরী : একা তো একজন মন্ত্রী কাজ করতে পারেন না। কিছু করতে হলে একটা টিম ওয়ার্ক প্রয়োজন হয়। কৃষির জন্য সার লাগে, পানি লাগে, বীজ লাগে। সার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে, আবার সাবসিডির বিষয়টা অর্থ মন্ত্রণালয়ের হাতে, গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান সিদ্ধান্তগুলো আসে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। এই সব কিছুর সম্মিলনের ফলেই আমরা সাফল্য পেয়েছি। আমাদের গত পাঁচ বছরের সাফল্যের কারণ হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার টিমটাকে কাজ করাতে পেরেছেন।

২০০০ : খাদ্য ঘাটতি পূরণ...

মতিয়া চৌধুরী : শুধু ঘাটতি পূরণ নয়, আমরা ৪০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণই করিনি, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন করেছি। মানে ক্ষুণ্নিবৃত্তি-স্বয়ংসম্পূর্ণতা-উদ্বৃত্ত, আমরা এখন উদ্বৃত্ত পর্যায়ে আছি।

২০০০ : আমি যদি প্রশ্নটা এভাবে করি যে, কৃষক শ্রম দিয়েছে আর প্রকৃতি সহযোগিতা করেছে। ফলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বেড়েছে।

মতিয়া চৌধুরী : এটা ভুলে গেলে চলবে না, মনে রাখতে হবে যে, বিএনপি আমলে একটাও বন্যা হয়নি। সেই সময় একটা ঘূর্ণিঝড় ছাড়া আর কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়নি। আমাদের সময়ে '৯৭ সালে একটা সাইক্লোন হয়েছে। হিডেনড্রাউট হয়েছে। '৯৮-এ বন্যা হয়েছে, ২০০০ সালেও যশোর অঞ্চলের ছয়টি জেলায় বন্যা হয়েছে। এই অঞ্চলে জীবনে কোনোদিন বন্যা হয়নি। সুতরাং আমাদেরকে অনেকগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়েছে।

আসল কথা হলো আমরা ব্যর্থতা দেখতে দেখতে এত অভ্যস্ত যে কারো সাফল্য বা সার্থকতাকে গুরুত্ব দিতে চাই না। আমাদের যে আত্মবিশ্বাস, আমাদের যে কর্মক্ষমতা সেটাকে বড় করে না দেখে অন্য কিছুর ওপর সেটাকে অ্যাকটিবিউট করি। আল্লাহর রহমত তো আছেই, কৃষকের শ্রম সেটাও সত্যি। এই কৃষক তো মুখে রক্ত উঠিয়ে আগেও খেটেছে। কিন্তু ফল পায়নি।

২০০০ : ফল এখন কতটা পাচ্ছে কৃষক। ধানের ন্যায্য মূল্য কী কৃষক পাচ্ছে?

মতিয়া চৌধুরী : ন্যায্য মূল্য নয়, সরকার লাভজনক মূল্য নির্ধারণ করেছে। এখন এই লাভজনক মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে আমাদের সাধারণ ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার কথাও বিবেচনা করতে হয়েছে। চালের কেজি যদি এক শ' টাকা করি তাহলে সেটা তো খুব লাভজনক হবে। কিন্তু এতে ভোক্তার তো বারোটা বেজে যাবে। আমরা ধানের মূল্য নির্ধারণ করেছি ৩২৫ টাকা মণ। সংবাদপত্র

ডায়রিয়া ফায়রিয়ার সময়ও আমি বলেছি, রোগের নাম ডায়রিয়াও না, কলেরাও না, আমাশয়ও না, কিছুই না। রোগের নাম হলো ক্ষুধা

এবং বেসরকারি টিভির খবরেও বলা হচ্ছে কৃষক ধান খেতের থেকে ২৪০ টাকা মণ বিক্রি করছে। খেতের ধান ভেজা এবং ওড়ানো ছাড়া। এই ধান শুকিয়ে বিক্রি করলে ৩০০ থেকে ৩২৫ টাকাই মূল্য পাওয়া যাবে।

বাজারে একটা কিছু বিক্রির জন্য নিয়ে আসলে যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে তাহলে সেদিন দাম কম পাওয়া যায়। কারণ বিক্রি না করে আবার যদি ফিরিয়ে আনা হয় তাহলে ভ্যান ভাড়ার কারণে ক্ষতি আরো বেশি হয়ে যায়। এটা একদিনের ঘটনা। এটাই আসল ঘটনা নয়।

এগ্রিকালচার একটা প্রাইভেট সেক্টর। কৃষক ধান চাষ করবে কিনা, সেটা সম্পূর্ণ তার নিজের স্বাধীনতা। ভাতের একটা কমপালশন আছে, তারপরও কৃষক সব জমিতে ধান চাষ নাও করতে পারে। কিন্তু কৃষক বেশি বেশি ধান চাষ করছে কেন? নিশ্চয় কৃষক উৎসাহ মূল্য পাচ্ছে। যেটাতে অন্তত কৃষকের লোকসান হয় না।

কৃষিকে যে গোনায় ধরা হচ্ছে এজন্য আমরা খুশি। কৃষি তো মনে হয় বীজ বুনলেই হয়ে গেল, বৃষ্টি হলেই চারা গজালো, আর এমনিতেই ফসল হয়ে গেল– এটাই তো অনেকের ধারণা। কিন্তু আমাদেরকে গোনায় ধরে যারা লিখছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

২০০০ : উৎপাদন খরচে কৃষকের শ্রমের মজুরি তো হিসাব করা হয় না। সেক্ষেত্রে...

মতিয়া চৌধুরী : একটি পত্রিকার রিপোর্টে লেখা হয়েছে, 'লোকসান সত্ত্বেও কৃষকরা গত কয়েক বছর বাম্পার ফসল কেন ফলিয়েছেন? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে ধারণা পাওয়া যায় ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বার বার বুকে বেঁধে ঝুঁকি নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত দেশের জমির মালিকদের মধ্যে একটা বড় অংশই রয়েছে নিজেরাই শ্রমিক হিসেবে। ফলে তাদের শ্রম খরচ ধরা হয়নি। এতে খাদ্য উৎপাদনে সামান্য লাভ ঘরে এসেছে। কৃষক কিছু হলেও লাভ পেয়েছে।'

তার মানে আগে তাহলে শ্রমের মূল্যটাও পেত না। আমরা এই উন্নতিটাতো করতে পেরেছি। 'বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়'। কৃষক ধান উৎপাদন করছে এবং তার লাভ ঘরে তুলছে। কৃষক শুধু ধানই নয়, গমও উৎপাদন করছে। আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন গম উৎপাদন ছিল বারো থেকে তেরো লক্ষ টন। এবছর গম উৎপাদিত হয়েছে ১৯ লক্ষ টনের উপরে। আমাদের আউশের জমি কমেছে কিন্তু উৎপাদন বেড়েছে। আগে ছিটানো আউশ হতো এখন ট্রান্সপারেন্ট আউশ হচ্ছে ফলন আগের চাইতে বেড়ে গেছে। এই কাজগুলো আমরা করেছি। দেয়ার ইজ ডেফিনেট ইমপ্রুভমেন্ট ইন ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি।

২০০০ : ধানের কারণে তো আমাদের রবিশস্যের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

মতিয়া চৌধুরী : ধান উৎপাদনের ফলেই রবিশস্যের উৎপাদন কমেছে। বিষয়টা সেরকম না। এমন হলে বিএনপি সরকারের সময়ে ডাল বা রবিশস্যের উৎপাদন বাড়তো। কিন্তু তা হয়নি। আসলে এই রবিশস্যের বিষয়টি নিয়ে কখনও সেভাবে চিন্তা করা হয়নি। এগুলোর উৎপাদন আগামী দিনে আমাদের বাড়াতে হবে। মার্চ মাসে আমাদের দেশে বৃষ্টি হয়। মার্চে বৃষ্টি হলে মসুরি ডালে কালো একটা দাগ পড়ে। কালো স্পট পড়লে ডাল নষ্ট হয়ে যায়, নষ্ট না হলেও দাম কমে যায়। মসুর চাষ থেকে ঘরে তোলা পর্যন্ত অনেক সময়ের ব্যাপার। এখন আমাদের শর্ট ডিউরেশন ভ্যারাইটি ইনভলভ করতে হবে। ধানের ক্ষেত্রে আমরা শর্ট ডিউরেশন আনতে পেরেছি। যেমন বিআর ২৯ ফলন অনেক বেশি হয় কিন্তু উৎপাদন সময় বেশি লাগে।

কিন্তু বিআর ২৮ ফলন একটু কম হয় কিন্তু সময় অল্প লাগে, এজন্য কৃষক বিআর ২৮ই চাষ করে। আমাদের যে কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট আছে তাদেরকে বলেছি শর্ট ডিটরেশন ভ্যারাইটির ওপর জোর দিতে। এমনকি এটাও বলেছি আর কিছু দরকার নেই, আপনারা শুধু খেসারির ডালটা ইমপ্রুভ করে দেন, টক্সিন ফ্রি করে দেন। যদিও খেসারির ডালে টক্সিন অত বেশি নেই। এ্যাংকার ডাল মার্কেটিং করার জন্য খেসারির ডালের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হয়েছিল।

২০০০ : তার মানে খেসারির ডাল খেলে ল্যাথারিজম হওয়ার যে...

মতিয়া চৌধুরী : খেসারির ডাল খেলেই যদি ল্যাথারিজম হতো তাহলে রোজার মাসে ঢাকা শহরের প্রতিটি মানুষের ল্যাথারিজম হতো। গরিব মানুষের প্রোটিনের চাহিদা যাতে কিছুটা পূরণ করা যায় এজন্য খেসারির ডালের ওপর জোর দিতে হবে।

২০০০ : যে সমস্ত অঞ্চলে ভাতের মতো খেসারির ডাল খাওয়া হয়...

মতিয়া চৌধুরী : আমি তো ডাক্তার না তাই অনেক কিছু বলতে পারবো না। আমার নিজের ধারাণা এই যে ডায়রিয়া ফায়রিয়ার সময়ও আমি বলেছি, রোগের নাম ডায়রিয়াও না, কলেরাও না, আমাশয়ও না, কিছুই না। রোগের নাম হলো ক্ষুধা। '৯৮-এর বন্যার পর আমি জানি, এটা আমি উইথ দ্য অথরিটি বলতে পারি– দুটি সেকশন খুব মর্মাহত হয়েছে। একটা হলো বিরোধী দল। যারা ভেবেছিল অনেক মানুষ মারা যাবে। এবং তারা আন্দোলন করে সরকার উৎখাত করবে। আর হতাশ হয়েছে ওষুধ কোম্পানিগুলো। রেনেটার এমডি আমাকে বলেছে, তারা যে পরিমাণ ওরস্যালাইনসহ অন্য ওষুধ তৈরি করেছিল, সেগুলো বিক্রি করতে তাদের দুই বছর লেগেছে। অন্যান্য ওষুধের কোম্পানিগুলোরও একই অবস্থা হয়েছে।

এর কারণটা কী? কারণ আমরা পানি যখন উঠেছে তখন সাহায্য করেছিই, এবং তারপরের প্রথম তিন মাসে দিয়েছি আট কেজি চাল, আট কেজি গম। তারপরের তিন মাসে দিয়েছি পাঁচ কেজি চাল পনেরো কেজি গম। অর্থাৎ ক্ষুধা মানুষকে আক্রমণ করতে পারেনি। ক্ষুধার জন্য অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে হয়নি। আমি নিজে তখন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। আমাদের কাছে একটা হিসেব ছিল। পাঁচ কেজি চাল আর ১৫ কেজি গম অর্থাৎ বিশ কেজি সাহায্য আমরা এমনভাবে দিলাম যে, প্রতিদিন যদি আড়াই পোয়া সেদ্ধ করা হয় ফেনা ভাত বা গমের জাউ করা হয়, তাহলে বাড়িতে যে বৃদ্ধ এবং শিশু আছে তারা অন্তত না খেয়ে থাকবে না। শুধু তাই নয়, বন্যার পরে আমরা প্রচুর পরিমাণে রিপেয়ার এবং কনস্ট্রাকশন কাজে হাত দিয়েছি। যাতে সামর্থ্যবান যারা তারা যেন কাজ করে খেতে পারে। আমরা মানুষকে অলসও বানাইনি, আবার না খেয়ে মরতেও দেইনি। পেটে যেহেতু খাবার ছিল, সেহেতু মানুষের অসুখও হয়নি।

মোনায়েম খানের আমলে বলা হতো, 'মানুষ না খাইয়া মরে নাই, ডাটা শাক ভক্ষণ করিয়া মরিয়াছে।'

২০০০ : যে অঞ্চলে ল্যাথারিজম...

মতিয়া চৌধুরী : আমি এই সমস্ত অঞ্চলে দেখেছি মানুষ দিনের পর দিন কিছুই খাচ্ছে না।

২০০০ : কুড়িগ্রামের অঞ্চলটা তো দীর্ঘদিন ধরে একটা নীরব দুর্ভিক্ষ অঞ্চল...

মতিয়া চৌধুরী : নীরব দুর্ভিক্ষ অঞ্চল ছিল। এখন নেই। এখন তো আর ল্যাথারিজমের কথা শোনা যায় না। আগে যেমন খেতো এখনো এই অঞ্চলের মানুষ খেসারি খায়। খ্যাসারির ডালের মতো পিঁয়াজু আর কিছু দিয়ে হয় না। আমরা যে পিঁয়াজুটা খাই তার সবটাই খেসারির ডাল। বেসনটাও তো খ্যাসারির ডালের। একটা পত্রিকায় পড়লাম দো-চুয়ানিতে সবচেয়ে বেশি আফলাটক্সিন আছে। তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এতদিনে সাফা হয়ে যাওয়ার কথা।

আমলা ছিল, আছে এবং থাকবে। এটা নিয়ে অনর্থক উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। সব স্তরেই কাজ করার লোক আছে, আবার ফাঁকি দেয়ার লোকও আছে

২০০০ : আমাদের দেশে যে বিভিন্ন প্রজাতির ধান ছিল, বলা হচ্ছে সেগুলো দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এগুলো সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা আপনাদের আছে কি না?

মতিয়া চৌধুরী : আমাদের 'বিড়ি' এবং 'বাড়ি'তে সব রকমের ধান সংরক্ষণ করা আছে। বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেটা ঠিক নয়। অন্ধ চায় চক্ষুষ্মান হতে, কুঁজো চায় সোজা হয়ে হাঁটতে। আর পঙ্গু চায় গিরি লঙ্ঘন করতে। যেখানে লাভ বেশি কৃষক সেটাই চাষ করবে। আমরা কোনোটাই কৃষকের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছি না।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন, অ্যাগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি, ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি, প্রিজারভেশনের কথা। আমরা আন্তর্জাতিক মার্কেটে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এশিয়ান মার্কেটে আমরা আগেও ছিলাম ভেজিটেবল নিয়ে। এবারই আমরা প্রথম ইউরোপিয়ান মার্কেটে চারটি আইটেম নিয়ে গিয়েছি। সেগুলো হলো, ঢেঁড়শ, গ্রিন চিলি, ফ্রেঞ্চ বিন এবং বেবি পাইনঅ্যাপেল বা জলডুবি আনারস। আমরা শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুরে আলু এক্সপোর্ট করছি।

২০০০ : আপনি শুরুতে বলেছেন, এককভাবে নয় টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ হয়। সাফল্য আছে দেখে এটা বলা যাচ্ছে। ব্যর্থতা থাকলে কিন্তু আপনার একার ওপরই দোষ পড়তো। যাই হোক, আমার প্রশ্ন হলো কৃষকের সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততা কীভাবে হয়?

মতিয়া চৌধুরী : আমাদের একটা সম্প্রসারণ বিভাগ আছে। এই বিভাগের মহাপরিচালক থেকে একেবারে নিচে ডিএস পর্যন্ত, সবাই সক্রিয় ছিল– এর জন্যে আমি আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর করি। আমি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছি, যেভাবে চেয়েছি তারা সেভাবে সক্রিয় হয়েছে। এখনো অনেক ত্রুটি আছে, তারপরও তারা বহুলাংশে সক্রিয় ছিল এবং আছে। রিসার্চ বিভাগও সাহায্য করেছে। সবকিছু মিলিয়ে মিনিস্ট্রিতে টিউনিংটা আমরা করতে পেরেছি। বলা যায় উচ্চাঙ্গ সংগীত গাওয়ার জন্যে হয়ত পারফেক্ট হয়নি, কিন্তু মোটামুটি পারফর্ম করার মতো গান গেয়ে গিয়েছি।

২০০০ : আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বিষয়ক একটা কথা প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কী?

মতিয়া চৌধুরী : আমলা ছিল, আছে এবং থাকবে। এটা নিয়ে অনর্থক উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। সমস্যা আসলে সেটা ধৈর্য নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। সব স্তরেই কাজ করার লোক আছে, আবার ফাঁকি দেয়ার লোকও আছে।

২০০০ : কাজ আটকে দেয়ার লোকও আছে।

মতিয়া চৌধুরী : হ্যাঁ, কাজ আটকে দেয়ার লোকও আছে। চ্যালেঞ্জটা তো ঐখানেই যে, কেউ কাজ আটকে দিলে আমি সেটা অতিক্রম করতে পারব কিনা, আর অলস লোককে দিয়ে কাজ করাতে পারব কিনা। চ্যালেঞ্জটা সবখানেই নিতে হবে। অনর্থক অন্যকে দোষ দেয়ার কোনো মানে নেই। অন্যকে দোষ দেয়ার আগে নিজের দুর্বলতাটাও দেখতে হবে। আমি এর জন্য পারলাম না, ওর জন্য পারলাম না– এই দোষ দেয়ার অভ্যেসটা আমার নেই।

২০০০ : নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য অন্যের ওপরে দোষ চাপানোর...

মতিয়া চৌধুরী : অন্যেরটা কী আমি জানি না। আমি মনে করি পারলাম না যেটা সেটা আমার দোষ। না, পারলে কেন আমি পারলাম না? প্রধানমন্ত্রী এই মন্ত্রণালয় চালানোর ব্যাপারে আমাকে তো সব রকমের স্বাধীনতা দিয়েছেন। এখানে সবাই আমার অধীনস্থ আমি বলব না, তবে সবাই আমার দিক নির্দেশনা মানার জন্য সরকারিভাবে বাধ্য। নীতিগতভাবেও বাধ্য। এখন যদি আমি

ঠিক মতো চালাতে না পারি তাহলে সেটা তো আমার অসম্পূর্ণতা, অদক্ষতা।

২০০০ : আপনাদের সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য কী বলে আপনি মনে করেন?

মতিয়া চৌধুরী : বড় বা একটা দুইটা উল্লেখ করে তো সাফল্যের কথা বলা যায় না। প্রথম সাফল্য আমরা তো টার্মটা পূরণ করলাম, এত বাধার ভেতরেও। এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের সংসদ, সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের সরকার। এবং সবচেয়ে বড় সাফল্য বড় বড় বিপদগুলো আমরা দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করেছি।

এবার যে লম্বা লম্বা হরতালগুলো হলো, টার্গেট ছিল যাতে তেল কৃষকের কাছে পৌঁছানো না যায়। সার হয়ত কৃষকের কাছে মজুদ থাকে, তেল থাকে না। আবার এই সময়টাতে একবেলা খেতে পানি দিতে না পারলে ধানের ফলন অনেক কমে যায়। এটা কৃষক বোঝে, ঢাকায় বসে আমরা অতটা বুঝি না। বিএনপি'র উদ্দেশ্য ছিল তেল নিয়ে ক্রাইসিস তৈরি করতে পারলে, কৃষক খেতে পানি দিতে পারবে না। ফলন কমে যাবে। কৃষক সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যাবে। তারা ১৮ জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছিল, এবার যদি ৩৬ জন মারা যায় তাহলে তো সরকার ফেলানো সহজ হবে। কিন্তু এটা তো হয়নি। আমরা হরতালেও কৃষকের কাছে তেল পৌঁছেছি। এটাও তো একটা বড় সাফল্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সবচেয়ে বড় সফলতা সি কুড মেক হার টিম ওয়ার্ক।

২০০০ : আমরা আপনার কৃষি মন্ত্রণালয়ের...

মতিয়া চৌধুরী : এটা বলতে আমি একটু কুণ্ঠাবোধ করছি। ক্ষুধার বলয় থেকে যে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি, এটাও তো আমাদের সরকারের সফলতা।

২০০০ : সেটা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই।

মতিয়া চৌধুরী : এটা আবার এভাবে বললে জিনিসটা দাঁড়ায় যে, আমি নিজের ঢোল নিজে পিটাচ্ছি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের একটা কথা আছে, 'নিজের ঢোল নিজে পিটাইতে নাই। আবার অন্যে পিটাইলে ফাটিয়া যাইতে পারে। তাই মাঝে মাঝে নিজের পিটাইতে হয়।'

২০০০ : আপনাদের সরকারের ব্যর্থতার মূল্যায়ন করবেন কীভাবে?

মতিয়া চৌধুরী : সব কাজ একবারে করে উঠতে পারলাম না– এটাই ব্যর্থতা। এতদিনের জমানো যে জঞ্জাল, তার সবটা আমরা পরিষ্কার করতে পারিনি। এটাকে অবশ্য আমি ব্যর্থতা বলব না, এটা আমাদের অসম্পূর্ণতা।

২০০০ : খাদ্যে দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভাতের নিশ্চয়তা পেয়েছে মানুষ। কিন্তু মানুষের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত করতে পেরেছেন?

মতিয়া চৌধুরী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে রিকশাওয়ালা ভাড়া নিয়ে যেতে সাহস করতো না। এখন যায় নির্দ্বিধায়।

২০০০ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু দেশে প্রতিদিন ১১টি খুন হচ্ছে।

মতিয়া চৌধুরী : ১১ জন লোক মারা যাচ্ছে এটা বাস্তবতা, পাশাপাশি ১ কোটি ১৭ লাখ লোকের শহর ঢাকা এটাও বাস্তবতা।

আমাদের যেটুকু শিক্ষা সেটা হলো, জীবনের পাঠশালা থেকে। সেটা অনেকের নেই। আমার এলাকার মানুষকে বলি আমি আপনাদের 'কামলা বেটি'। পাঁচ বছরের জন্যে ভোট দিয়ে আপনারা আমাকে রেখেছেন

আমি নিজেও এক সময় খবরের কাগজে চাকরি করেছি। এই ধরনের সংবাদ আগে মোটেই আসত না।

আর একটি দিক আপনারা ভুলে যান যে, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশকে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের রুট হিসেবে ব্যবহারের একটা প্রস্তুতি খুব ভালোভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। একটা দেশ যখন গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের রুটে পড়ে যায় তখন সেখান থেকে বের হয়ে আসতে সময় লাগে।

প্রকাশ-বিকাশ-সুইডেন আসলাম, এরা কিন্তু আগে ধরা পড়েনি। এখন ধরা পড়েছে। এই সন্ত্রাসীরা আমাদের সময়ে তৈরি হয়নি। তৈরি হয়েছে আমাদের সময়ের আগে। এদের হাতে কিছু মানুষ মারা যাচ্ছে। এটাই বাস্তবতা, আমি অস্বীকার করছি না। আবার এটাও বাস্তবতা আমরা তাদের ধরেছি।

২০০০ : আপনি যে সন্ত্রাসীদের নাম বললেন, সেই তালিকায় আরো অনেকগুলো নাম যোগ করা যায়। এই সন্ত্রাসীরা গড়ে ওঠে সমাজের কিছু মানুষের শেল্টারে। শেল্টারদাতাদের মধ্যে যেমন বিএনপি'র লোক আছে, তেমনি আওয়ামী লীগের লোকও তো আছে।

মতিয়া চৌধুরী : নগরে আগুন লাগলে দেবালয় অক্ষত থাকে না। যখন আপনি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে একটা বাহিনী করে আমাকে আক্রমণ করবেন, তখন আমিও একটা বাহিনী করছি বাঁচার জন্য। এভাবেই সূত্রপাত হয়েছে। এটা সমর্থনযোগ্য আমি বলি না। তবে এটা হলো বাস্তবতা।

আমাদের প্রচেষ্টা আছে, আমাদের ইচ্ছে আছে, আমাদের আন্তরিকতা আছে– এর থেকে বের হয়ে আসতে চাই আমরা।

২০০০ : আপনাদের দলের সন্ত্রাসের অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে সেই জয়নাল হাজারী বা আবু তাহেরের বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

মতিয়া চৌধুরী : যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে কেস হয়েছে। আসলে যে জায়গাগুলোর কথা বলছেন সেখানে একদিনে এই অবস্থা তৈরি হয়নি। একতরফা জিনিসগুলো ঘটছে তাও নয়।

২০০০ : ফেনীতে শুধু একজন জয়নাল হাজারী আছেন তা নয়। ভিপি জয়নালের মতো সন্ত্রাসীও ছিল ফেনীতে। কিন্তু আপনারা বিএনপি'র ভিপি জয়নালকে ধরছেন কিন্তু জয়নাল হাজারীকে ধরছেন না।

মতিয়া চৌধুরী : শুধু ভিপি জয়নাল নয়, আওয়ামী লীগের যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ আছে, তাদের অনেকেই অ্যারেস্ট হয়েছে। যারা অ্যারেস্ট হয়নি আইনের আওতায় পড়লে তারা অ্যারেস্ট হবে। আমাদের এমপি মুহিবুর রহমান মানিক অ্যারেস্ট হয়েছে।

২০০০ : প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। রাস্তার নেত্রী মতিয়া চৌধুরী আর মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর পার্থক্য কতটা?

মতিয়া চৌধুরী : আমরা তো গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় এসেছি। আমাদের মাথায় সব সময় এটা কাজ করে যে, পাঁচ বছর পরে আবার মানুষের কাছে ভোট চাইতে হবে। কাজেই মন্ত্রিত্ব আমাদের জনগণ থেকে দূরে নিয়ে যায় না। মন্ত্রিত্ব আমাদের কোনো আর্টিফিশিয়াল অ্যাটমোসফেয়ার সৃষ্টি করে না। আমি এলাকায় গিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটি। এই মাসের প্রথমদিকেও ২২ কিলোমিটার হেঁটেছি। মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, ব্রিজ কালভার্টের নির্মাণ কাজ দেখেছি। আমি নিজের এলাকা ছাড়াও '৯৭ সালে ঘূর্ণিঝড়ের সময় চট্টগ্রামে গিয়েও মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। মানুষ থেকে তো আমি দূরে চলে যাইনি যে, মন্ত্রী হয়ে নিজেকে আলাদা মনে করব। কৃত্রিম কোনো আবহাওয়ার মধ্যে তো আমি নেই।

২০০০ : আপনি যখন এলাকায় যান

তখন মানুষের সঙ্গে আপনার দেখা হয়।

মতিয়া চৌধুরী : আমার বাসায়ও লোক আসে। তবে এলাকার মানুষকে আমি অন্যভাবে বলি। জরুরি কাজ থাকলে ঢাকায় আসবেন। ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য ঢাকায় আসতে হবে। যে কাজটা ঢাকায় না গেলেও চলে সেটা আমাকে দিয়ে এলাকা থেকেই করিয়ে নেবেন। ঢাকায় আসলে আপনার বাস ভাড়া আমি দিতে পারব না, থাকার জায়গা দিতে পারব না। বড় জোর এক কাপ রঙ চা আর টোস্ট বিস্কুট পাবেন। তাহলে আপনি শুধু শুধু ঢাকায় আসবেন কেন?

চাকরির ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার জন্যে আমি কোনো তদবির করি না। লিখিত পরীক্ষায় নিজের যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হলে মৌখিক পরীক্ষার সময় আমি একজনের জন্য ফোন করি। দশজনের জন্যে ফোন করলে তো হবে না। আমার কাছে সর্বপ্রথম যে এসে পৌঁছায় তার জন্য আমি ফোন করি। সে আওয়ামী লীগ, না বিএনপি সেটা দেখি না। আমি কোনো বদলির তদবির করি না। সরকারি চাকরি করলে বদলি হতে হবে। মায়ের আঁচলের নিচে বা শ্বশুরবাড়িতে থেকে আরাম-আয়েশের সঙ্গে চাকরি করতে চাইলে সরকারি চাকরিতে যোগ দেয়ারই প্রয়োজন নেই।

২০০০ : এলাকায় ত্রাণ বন্টন বা অন্য কোনো কাজের ক্ষেত্রে নিশ্চয় আপনার কাছে দুর্নীতির কিছু খবর আসে। সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবস্থা নেন কীভাবে?

মতিয়া চৌধুরী : দুর্নীতির অভিযোগ আসলে, প্রমাণ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। আমার এলাকার দুইজন মেম্বারের বিরুদ্ধে প্রসিডিং হয়েছে, একজন জেলেও গেছে। মাপে কম দিয়েছিল এরকম লোকও জেলে গেছে। রিলিফ দেয়ার সময় আমি তো সব সময় সামনে বসা থাকি। আমি বসে থাকলে মাপটা ঠিক হয়। দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

২০০০ : আপনি যখন বিরোধী দলের এমপি তখন এলাকার মানুষের জন্যে কীভাবে কাজ করবেন?

মতিয়া চৌধুরী : বিরোধী দলের এমপিদের এলাকায় তো বিএনপি সরকার প্রায় কিছুই দিত না। সামান্য যা পেতাম চেয়ারম্যান মেম্বারের সঙ্গে মিটিং করে মানুষের মধ্যে বিতরণ করতাম। মিটিং করার সময় আমি সব দরজা জানালা খুলে দিতে বলি। আমি চাই মানুষ শুনুক মিটিংয়ের কথা। অনেক সময় আমি মিটিংয়ে হ্যান্ড মাইক নিয়ে কথা বলি যাতে বাইরে দাঁড়ানো মানুষ শুনতে পায় সে কী পাবে। মানুষের মধ্যে হাঁটলে, মানুষের কথা শুনলে অনেক কিছু বোঝা যায়। মানুষের সব সমস্যার সমাধান আমরা করে দেব এটা কিন্তু মানুষ আশা করে না। বলার যে একটা জায়গা আছে সেটাতেই মানুষ খুশি হয় কীভাবে?

২০০০ : আপনি এলাকার মানুষকে ছাগল কিনে দিয়েছেন বলে শুনেছি।

মতিয়া চৌধুরীর সাফল্য এখানেই। তিনি কোনো অজুহাত দেখাননি। সব সমস্যা মোকাবেলা করেছেন। সরকারি কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে পর পর ছয় বার বান্দার ফলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি

মতিয়া চৌধুরী : হ্যাঁ, এক সময় দিয়েছি।

২০০০ : কীভাবে দিয়েছেন?

মতিয়া চৌধুরী : এমপি হিসেবে আমি ভাতা পেতাম, সেই ভাতা'র টাকা দিয়ে ছাগল কিনতাম। একটা ছাগলের দাম আড়াই'শ, তিন'শ টাকা। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে হয়ত আমি অনেকগুলো ছাগল কিনলাম। সেই ছাগলগুলো মানুষকে দিতাম। আমার তো অনেক টাকা নেই। আমার সামর্থ্য তো সীমিত। তবে মানুষের চাহিদাও খুব সামান্য।

২০০০ : ছাগল প্রকল্প নিয়ে বলছিলেন। এই ছাগল যারা পায় তারা কতটুকু উপকৃত হয়।

মতিয়া চৌধুরী : একটা ছাগল বছরে দু'বার বাচ্চা দেয়। একবারে দু'তিনটি বাচ্চা দেয়। একটা ছাগল একজন এক বছর পাললে সে এক দেড় হাজার বা আরো বেশি টাকা আয় করতে পারে। আমি ছাগল দেয়ার সময় ছোট একটা আনুষ্ঠানিকতা করি। পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয় দু' বছরের মধ্যে ছাগল বিক্রি করা যাবে না। বলে দেই বিক্রি করলে তাকে পুলিশে দেয়া হবে। আর মানুষ যে কত অল্পতে উপকৃত হয় সেটা আগেই তো বললাম।

একটা ঘটনা বলি। আমি তখন বিরোধী দলে। আমার পাহাড়ি এলাকার একটা থানা। '৯৩ সালে পাহাড়ি ঢলে একটা বন্যা হলো। অনেকগুলো বাড়িঘর তছনছ হয়ে গেল। কিছু টাকা গেল আমার এলাকায়। যাদের বাড়িঘর ভেঙেছে তাদের মাঝে এক'শ টাকা করে দিতে পারলাম। এর অনেকদিন পর। আমি গ্রামে হাঁটছি। এক বৃদ্ধা মহিলা আমার হাত ধরে বলল, 'কেমন আছেন? আপনার টাকায় আমার খুব উপকার হয়েছে। আমার ঘরটা দাঁড়ায়ে গেছে।' আমি বললাম এক'শ টাকায় ঘর হয়ে গেল? যে বলল, 'আমার ঘরের বেড়াগুলো ছিল। টাকা ছিল না বলে কিছু করতে পারছিলাম না। টাকা পাওয়ার পর পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে গেলাম। তারা আমাকে চারটা বাঁশ দিল। তারপর কিছু তার কিনে আমার ছেলে আর আমি মিলে ঘরটা দাঁড় করিয়েছি। লেপে ফেলেছি। মিলাদও পড়িয়েছি।'

আমি বললাম কীভাবে মিলাদ পড়িয়েছ?

যে বলল, 'মৌলভী চেয়েছিল পাঁচ টাকা। আমি তিন টাকা দিয়ে মিলাদ পড়িয়েছি।'

এই তো আমাদের দেশ। এই মানুষের জন্যে কিছু করলে যে দাঁড়াতে সে পারে না, আমি সেটা বিশ্বাস করি না। আমি মন্ত্রী হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি, আর ট্রেনিং নিয়েও মন্ত্রী হইনি। আমাদের যেটুকু শিক্ষা সেটা হলো, জীবনের পাঠশালা থেকে। সেটা অনেকের নেই। আমার এলাকার মানুষকে বলি আমি আপনাদের 'কামলা বেটি'। পাঁচ বছরের জন্যে ভোট দিয়ে আপনারা আমাকে রেখেছেন।

মতিয়া চৌধুরী এই কথাগুলো বললেন তার ভেতরের অনুভূতি থেকেই। তার জীবন দর্শন এমনই। যে আদর্শবাদ থেকে তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন ক্ষমতার চেয়ারে বসে তা হারিয়ে যায়নি। আর এ কারণেই তিনি সফল। এ সফলতা এসেছে কৃষকের হাত হয়ে।

আদমজী শ্রমিক নেতাদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'সারা দেশের মাত্র দুই পার্সেন্ট লোক ধর্মঘট করে। আমার আসল লোক কৃষকরা হরতাল করলে সারা দেশকে না খেয়ে থাকতে হত।'

কৃষকের শ্রম থেমে থাকেনি কখনই। শ্রমিক নেতাদের হরতাল, ধর্মঘটের পরও কৃষক সচল রেখেছে তার লাঙ্গল। উৎপাদন বন্ধের কথা সে চিন্তাও করে না। সে শুধু চায় সার আর ডিজেলের নিশ্চয়তা। অথচ এতটুকু কাজ করতেই ব্যর্থ হয় আমাদের সরকার। দেখানো হয় বিভিন্ন অজুহাত। মতিয়া চৌধুরীর সাফল্য এখানেই। তিনি কোনো অজুহাত দেখাননি। সব সমস্যা মোকাবেলা করেছেন। সরকারি কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে পর পর ছয় বার বান্দার ফলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। এখন তার সফলতাই আওয়ামী লীগের শেষ ভরসা।

কয়েক ডজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রীর ব্যর্থতা কী আওয়ামী লীগ কাটিয়ে উঠতে পারবে এই একজনের সফলতা দিয়ে?

ছবি : **ডেভিড বারিকদার**
সহযোগিতা : **আসজাদুল কিবরিয়া**
জয়ন্ত আচার্য